গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ

Technology developed by Salinity Management and Research Center (SMRC)

প্রকাশনায়

গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর
কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিআই অংগ)
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, খুলনা।

প্রণয়নে

অমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
বটিয়াঘাটা, খুলনা।

সম্পাদনা

শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস
প্রকল্প পরিচালক
গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর
কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিআই অংগ)
খুলনা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

বিধান কুমার ভান্ডার
মহাপরিচালক
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি খামার সড়ক, ঢাকা-১২১৫।

প্রকাশকাল

মে, ২০২০ খ্রিঃ

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
বটিয়াঘাটা, খুলনা।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১	পটভূমি	০৩
০২	লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের অবস্থান	০৩
০৩	লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা	০৩
০৪	লবণাক্ত ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্যসমূহ	০৪
০৫	খামার পুকুর প্রযুক্তি	০৫
০৬	কলস সেচ প্রযুক্তি	০৯
০৭	দ্বিস্তর মালচিং পদ্ধতি	১২
০৮	অগভীর রিজ এন্ড ফারো চাষ পদ্ধতি	১৫
০৯	ফ্লাইং বেড কৃষি	১৭
১০	লবণাক্ত এলাকায় বিনা চাষে ডিবলিং এবং চারা রোপন ও পলিব্যাগের চারা রোপন পদ্ধতিতে আগাম ভুট্টা চাষ	১৯
১১	পলিব্যাগের চারা রোপনের মাধ্যমে লবণাক্ত এলাকায় আগাম তরমুজ চাষ	২৩
১২	পলিথিন বা স্ট্রবেডে সবজি চাষ	৩০
১৩	দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি ঘেরের বেড়ি বাঁধে বর্ষাকালে (খরিফ-২ মৌসুমে) টমেটো চাষ	৩২
১৪	ঘেরের বাঁধে উর্বর মাটি দ্বারা আস্তরিত করে সবজি চাষ	৩৬
১৫	লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রে ক্রীনিং এর মাধ্যমে বাছাইকৃত লবণ সহনশীল ফসলের নাম ও জাত	৩৮
১৬	উপসংহার	৪০

পটভূমি

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে একটি বৃহৎ অংশ নিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা গঠিত। এই উপকূলীয় এলাকার আয়তন প্রায় ২.৮৫ মিলিয়ন হেক্টর যা মোট আবাদযোগ্য জমির প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ। এর মধ্যে প্রায় ১০.৫৬ লক্ষ হেক্টর জমি বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ উপকূলীয় এলাকার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। এই বিশাল এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততার কারণে অধিকাংশ জমি পতিত থাকে এবং শুধুমাত্র বর্ষাকালে আমন মৌসুমে যখন মাটি ও পানির লবণাক্ততা কমে আসে, তখন আমন ধানের আবাদ হয়।

দেশের জন সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস, খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, সর্বোপরি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে এই এক ফসলি লবণাক্ত জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI) অত্র গবেষণা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে।

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের অবস্থান

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রটি (SMRC) খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের গাগরামারী মৌজায় অবস্থিত। খুলনা জেলার সদর হতে ১৬ কিঃ মিঃ ও বটিয়াঘাটা উপজেলা হতে ৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে খুলনা-দাকোপ সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। গবেষণা কেন্দ্রের ১০০ গজ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে কাজিবাছা নদী, যা দক্ষিণে পশুর নামে বঙ্গোপসারের দিকে ধাবিত হয়েছে। গবেষণা কেন্দ্রের মোট আয়তন প্রায় ৪ হেক্টর।

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রটি মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের Soil Testing Management & Development of SRDI প্রকল্পের একটি component যা ০৭-১২-১৯৯২ইং তারিখে ECNEC কর্তৃক অনুমোদনের পর প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর নিমিত্তে ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি জনবল নিয়োগ করা হয় এবং ৭-৬-১৯৯৫ সালে জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ১৯৯৬ সালে গবেষণা প্লট, সেচ ব্যবস্থাপনা, ল্যাবরেটরী ও রিসার্চ ষ্টেশন বিল্ডিং ছাড়াই অত্যন্ত সীমিত আকারে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এভাবেই কয়েক বৎসর Observatory Research Activities চলতে থাকে। ১৯৯৭ সালে ল্যাবরেটরী ষ্টেশন বিল্ডিং নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয় এবং ১৯৯৯ সালে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এভাবেই কয়েক বৎসর Observatory Research Activities চলতে থাকে। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্যসমূহ (Main Ovjectives of SMRC)

- অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য মাটি পানির লবণাক্ততা কমানোর কলাকৌশল উদ্ভাবন।
- লবণাক্ততার মাত্রা অনুযায়ী এলাকাভিত্তিক উপযোগী "ফার্মিং সিস্টেম" উদ্ভাবন।
- লবণাক্ততা সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ফসলের জাত নির্বাচন।
- লবণাক্ত এলাকার মাটি, পানিসহ কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ (Resource) শনাক্তকরণ ও সেগুলো ব্যবহারের উপর গবেষণা করা।
- বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সংরক্ষণ এবং সে সকল তথ্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও গবেষণার কাজে ব্যবহার।

লবণাক্ত ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র
Salinity Management and Research Center (SMRC)

খামার পুকুর প্রযুক্তি

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ২৮.৫ লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় এলাকার মধ্যে প্রায় ১০.৫৬ লক্ষ হেক্টর এলাকা বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ত কবলিত। এই লবণাক্ততার কারণে শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে ফসল চাষ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাধারণত বর্ষাকালে এ এলাকায় আবাদকৃত দেশী জাতের আমন ধান মাঠ থেকে সংগ্রহ করতে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত লেগে যায়। জমি থেকে পানি নেমে যাওয়ার পর জমির মাটি শুকাতে শুরু করলে মাটিতে লবণাক্ততাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এলাকাভেদে মাটির লবণাক্ততা বিভিন্ন হয়। উজান থেকে নেমে আসা মিষ্টি পানির প্রবাহের সঙ্গে এসব এলাকার মাটির লবণাক্ততার পরিমাণ বহুলাংশে নির্ভর করে। এছাড়া এই সময়ে নদীর পানির লবণাক্ততা ২৫.০-৩০.০ ডিএস/মি. পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। আবার এই এলাকার খালগুলো পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুকনো মৌসুমে ফসল চাষের নিরাপদ পানির সংস্থান কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই শুধুমাত্র মাটি ও পানির লবণাক্ততার কারণে এ এলাকায় বোরো ধান চাষসহ অন্যান্য সবজি চাষ সম্ভব হয় না। লবণাক্ততার পাশাপাশি এ এলাকার আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো মন্দ নিষ্কাশন ব্যবস্থা। অর্থাৎ জমিতে সময়মতো "জো" আসে না। তাই ইচ্ছা থাকলেও এ এলাকার কৃষকেরা রবি ফসল চাষ করতে পারেন না। এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুকনো মৌসুমে সীমিত আকারে তিল ও মুগডালের চাষ হয়ে থাকে। তবে দেরীতে বীজ বপনের ফলে, দেরীতে ফল পরিপক্ক হয়। অর্থাৎ তিল ও মুগডাল ঘরে তোলার আগেই কখনেও কখনও বর্ষার পানিতে নষ্ট হয়ে যায়। এসব সমস্যা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র গবেষণা করে চলেছে। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লবণাক্ততা কমিয়ে রেখে এবং সময়মতো জমিতে "জো" আনার পরিবেশ সৃষ্টি করে এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে শুধু একটি ফসল চাষ হয় সেখানে দুইটি বা তিনটি ফসল চাষ করা সম্ভব। লবণাক্ত মাটিতে যদি নিরাপদ (মিষ্টি) পানি সেচের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়, তাহলে ঐ মাটির লবণাক্ততা কমে যায়, ফলে সেখানে সহজেই ফসল চাষ করা সম্ভব হয়। এছাড়া, কোনও জমির মাটি যদি উঁচু করা সম্ভব হয়, সেখানে সময়মতো "জো" আসবে এবং রবি ফসলও চাষ করা সম্ভব হবে। তাই, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র এই সব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে উদ্ভাবন করেছে "খামার পুকুর প্রযুক্তি"। এই 'খামার পুকুর প্রযুক্তি'র মাধ্যমে জমির লবণাক্ততা কমিয়ে এবং সময়মতো "জো" এনে বছরে ২/৩ টি ফসল চাষ সম্ভব।

খামার পুকুর প্রযুক্তি কী

খামার পুকুর প্রযুক্তি এমন একটা প্রযুক্তি যাতে উপকূলীয় এলাকায় একটি খামারের মধ্যে পুকুর কেটে ঐ পুকুরে বর্ষাকালের পানি জমিয়ে রেখে সেই পানি দিয়ে শুকনো মৌসুমে ফসল চাষ করার প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তিও বলা হয়।

নির্মাণ প্রণালী

- কোনও একটি জমির পাঁচ ভাগের একভাগ জমিতে মোটামুটি ৬-৭ হাত গভীরতার ১ টি পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে।
- জমির যে অংশটা অপেক্ষাকৃত নীচু সে অংশে পুকুরটি খনন করতে হবে।
- পুকুরের চারদিকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখতে হবে, যাতে পানি আগমন ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বাঁধের উচ্চতা হবে দুই থেকে আড়াই হাত ও প্রস্থ হবে তিন থেকে চার হাত।
- অবশিষ্ট মাটি দিয়ে ঐ জমির বাকী চার ভাগ ভরাট করতে হবে। এতে জমিটা প্রায় ১ হাত উচুঁ হবে। ফলে ঐ জমির নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং রবি মৌসুমে সময়মত "জো" আসবে এবং বীজ বপন করা সম্ভব হবে। সময় মত জো না আসার ফলে স্বাভাবিক জমিতে যেটা সম্ভব হয় না।

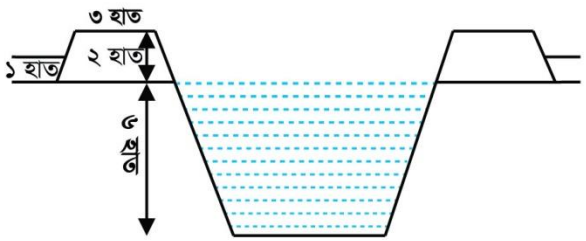

চিত্র: খামার পুকুরের লেআউট

- জমিতে মাটি এমনভাবে ফেলতে হবে যাতে উপরের মাটি উপরে থাকে। কারণ উপরের মাটিতে পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। কোনও ভাবেই নিচের মাটি যেন উপরে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের কোথায়ও কোথায়ও কষ মাটির উপস্থিতি আছে । এরূপ ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল পাওয়ার জন্য ফসল আবাদ/মাছ চাষ উভয় ক্ষেত্রেই চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে ।

- এছাড়া, বর্ষাকালে মাঠের অতিরিক্ত পানি প্রয়োজনে পুকুরে এসে জমা হতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ভূমির নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য জমিটিকে ভালভাবে সমতল করতে হবে। এতে করে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে যাবে। ফলে সর্বত্র উদ্ভিদের পানি ও পুষ্টি উপাদানের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা হবে এবং ঐ জমির লবন নিচে চুইয়ে যাবে।

কয়েকটি খামার পুকুর প্রযুক্তির লেআউট

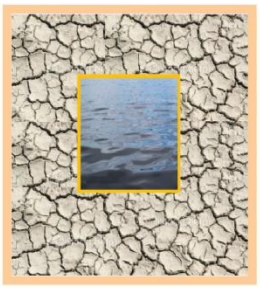

চিত্র-২: খামারের মধ্যে পুকুর

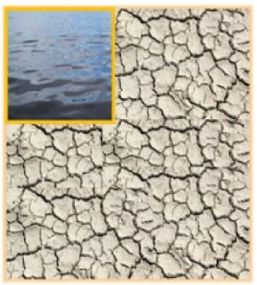

চিত্র-৩: খামারের কোণায় পুকুর

চিত্র-৪: খামারের পাশে পুকুর

চিত্র: কৃষকের মাঠে খামার পুকুর

খামার পুকুর প্রযুক্তির সুবিধা

- লবণাক্ত এলাকায় শুকনো মৌসুমে নিরাপদ পানির উৎস হিসেবে খামার পুকুর প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর।
- এছাড়া খামার পুকুর এলাকার পানি দ্রুত নিষ্কাশন হওয়ার ফলে জমিতে আগাম 'জো' আসবে এবং রবি ফসল চাষ করা সম্ভব হয়।
- উপরের স্তরের মাটি (Top Soil) ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাঁধের উপর/পাশে শাকসব্জি/ফলজ/বনজ/ঔষধি গাছ লাগানো যেতে পারে ।
- পুকুরে মাছ চাষ /হাঁস পালন এবং উপরিভাগে মুরগী খামার করা যেতে পারে ।
- শুকনো মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা সম্ভব হয়, তাই একটি টেকসই ফসল বিন্যাসের মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বাড়ানো সম্ভব।

সতর্কতা

- প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার পানির লবণাক্ততা পরীক্ষা করতে পারলে ভাল হয়।
- রবি মৌসুমে কম সেচ লাগে এমন শস্য বিশেষ করে 'মাদা ফসল' যেমন তরমুজ, কুমড়া, উচ্ছে, ঝিঙ্গা ইত্যাদি ছাড়াও পুঁইশাক, ঢেঁড়শ চাষ করা যেতে পারে।

কলস সেচ (Pitcher Irrigation) প্রযুক্তি

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৮টি জেলার ৯৩টি উপজেলা বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততায় আক্রান্ত। লবণাক্ততার কারণে এই এলাকার শস্য নিবিড়তা মাত্র ১৫৩ শতাংশ। শুকনো মৌসুমে এই এলাকার অধিকাংশ জমি পতিত থাকে। কোনও কোনও এলাকায় সীমিত আকারে তিল বা মুগডালের চাষ হয়। আবার দেরিতে পানি অপসারনের কারনে সময়মতো তিল বা ডালের বপন করা সম্ভব হয় না। দেরিতে তিল, ডালের বপনের ফলে তিল, ডাল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই বর্ষার পানিতে তা নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে এই এলাকায় শুকনো মৌসুমে নিরাপদ পানির (লবণমুক্ত) অভাবে আমন ধানের পরে বোরো ধান চাষও সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে বিরাট একটি এলাকা পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে। এই অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র লবণাক্ততা কবলিত এলাকায় শুকনো মৌসুমে ফসল চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করে চলেছে। সম্প্রতি এই গবেষণা কেন্দ্র হতে উদ্ভাবিত একটি প্রযুক্তির নাম "কলস সেচ (Pitcher Irrigation)" প্রযুক্তি। 'কলস সেচ' প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় শুকনো মৌসুমে ফসল উৎপাদন করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

কলস সেচ (Pitcher Irrigation) প্রযুক্তির উদ্দেশ্য

- মাটির লবণাক্ততার মাত্রা কমিয়ে ফসল চাষ
- অল্প পরিমানে সেচের পানি ব্যবহার করে মাদা ফসল (কুমড়া,তরমুজ, উচ্ছে, ঝিংগা ইত্যাদি) উৎপাদন
- সেচের পানির অপচয় রোধ ও সুষম ব্যবহার
- উদ্ভিদের খাদ্য উপাদান গ্রহনে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা

কলস সেচ (Pitcher Irrigation) প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র সমূহ

- কলস সেচ প্রযুক্তি শুধুমাত্র মাদা ফসল যেমনঃ কুমড়া,তরমুজ,উচ্ছে,ঝিংগা ইত্যাদির জন্য উপযোগী
- যেসব এলাকায় শুকনো মৌসুমে নিরাপদ পানির পর্যাপ্ত উৎস থাকে না।
- যেসব এলাকায় পানি সেচের জন্য শ্রমিকের অভাব দেখা যায়।

কলস সেচ প্রযুক্তির কার্যপ্রণালী

- একটি সাধারণ আকারের মাটির কলস সংগ্রহ করতে হবে।
- কলসের নিচে ড্রিল মেসিন দ্বারা বল পয়েন্ট কলমের আকারে (পরিধি আনুমানিক ২.২ সেমি) ছিদ্র করতে হবে এবং ঐ ছিদ্রে দেড়-দুই হাত পাট শক্ত করে প্রবিষ্ট করতে হবে।

চিত্র: খালি কলসী

চিত্র: পাটের আঁশ লাগানো কলসী

- পাটযুক্ত কলসটিকে মাদার মাঝখানে এমনভাবে বসাতে হবে যেন ছিদ্রগুলি ও পাটের আঁশ মাটির নিচে থাকে।
- কলসের চারপাশে ৩-৪ টি বীজ বপন করতে হবে। তাহলে কলসের চারপাশে চারা গজাবে।

চিত্র: প্রচলিত সেচে উৎপাদিত কুমড়া চারা

চিত্র: কলস সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত কুমড়া চারা

- কলসের ছিদ্রের সাথে সংযুক্ত পাট ধীরে ধীরে পানি বহন করে নিয়ে গাছের গোড়ায় সরবরাহ করবে। এতে মাদা সবসময় ভিজে থাকবে। ফলে মাটির নিচ স্তর থেকে মাদা এলাকায় (গাছের শিকড় সংলগ্ন এলাকায়) লবনযুক্ত পানি উঠে আসবে না এবং এর ফলে মাদা এলাকায় লবণাক্ততার পরিমাণ কম থাকবে। সেই সাথে গাছ পর্যাপ্ত পানি ও খাদ্য উপাদান আহরণ করতে পারবে এবং গাছ সতেজ থাকবে।

কলস সেচ পদ্ধতিতে মাদার লবণাক্ততার পরিমাণ ২.০ থেকে ২.৫ ডিএস/মি পর্যন্ত কমিয়ে রাখা সম্ভব। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণায় দেখা গেছে, শুকনো মৌসুমে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাদায় সেচ প্রদান করলে যেখানে লবণাক্ততার পরিমাণ ৮.০ থেকে ১২.০ ডিএস/মি এর মধ্যে থাকে, সেখানে কলস পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে লবণাক্ততার পরিমাণ ৫.৫ থেকে ৬.৫ ডিএস/মি এর মধ্যে রাখা সম্ভব। এ মাত্রার লবণাক্ততায় মাদা ফসল চাষ করা সম্ভব।

অর্থনৈতিক হিসাব (ফসল-কুমড়া, জাত-সুইটি)

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপণা ও গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণায় দেখা গেছে কলস পদ্ধতিতে সেচকৃত একটি মাদা থেকে প্রায় ৩০ কেজি কুমড়া উৎপাদন সম্ভব। প্রতি কেজি কুমড়া ৮ টাকা কেজি দরে মাদা প্রতি বিক্রয় মূল্য ২৪০ টাকা।

কলস, সার, কীটনাশক,পানি ও শ্রমিক খরচ মাদা প্রতি ১২৫ টাকা। অতএব মাদা প্রতি লাভ (২৪০-১২৫)=১১৫ টাকা।

অন্যদিকে প্রচলিত সেচ পদ্ধতিতে সেচকৃত একটি মাদা থেকে প্রায় ১৮ কেজি কুমড়া উৎপাদন সম্ভব। প্রতি কেজি কুমড়া ৮ টাকা কেজি দরে মাদা প্রতি বিক্রয়মূল্য ১৪৪ টাকা।

সার, কীটনাশক, পানি ও শ্রমিক খরচ ৯৫ টাকা। এ ক্ষেত্রে মাদা প্রতি লাভ (১৪৪-৯৫) = ৪৯ টাকা।

এছাড়া একটি কলস সাবধানে ব্যবহার করলে কমপক্ষে দুই বছর ব্যবহার করা সম্ভব।

দ্বিস্তর মালচিং পদ্ধতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাটি শুকনো মৌসুমে (খরিফ-১) লবণাক্ত অবস্থায় থাকে। সাধারণত মাটির লবণাক্ততা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস হতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং এপ্রিল-মে মাসে সর্বোচ্চ থাকে। কালবৈশাখী ঝড় শুরু হলে জুন মাস হতে মাটির লবণাক্ততা কমতে শুরু করে। দক্ষিণাঞ্চলের আরেকটি সমস্যা হলো মাটির নিচে স্বল্প গভীরেই লবণাক্ত পানির স্তর দেখা যায়। তাই, শুকনো মৌসুমে মাটির উপরে যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন উপরিস্তরের মাটির পানি বাস্পায়িত হয়ে উড়ে চলে যায়। এবং কৈশিক রন্ধ্র দিয়ে লবণ পানি মাটির উপরিস্তরে উঠে চলে আসে। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে। মাটির উপরিস্তর হতে পানি বাস্পায়িত হয়ে চলে গেলে মাটির উপরিস্তরে লবণ পড়ে থাকে। এবং উপরিস্তরের মাটি নিম্ন স্তরের চেয়ে অধিক লবণাক্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিস্তর মালচিং পদ্ধতিতে মাটির নিচ হতে লবণাক্ত পানি উপরে উঠে আসা রোধ করা যায় এবং এর ফলে মাটির উপরিস্তরের লবণাক্ততা কমিয়ে ফসল চাষ করা সহজতর হয়। বিশেষ করে মাদা ফসলে দ্বিস্তর মালচিং পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে মাটির দুই স্তরে ধানের খড় মাল্চ হিসেবে ব্যবহার করে মাটির সার্বিক লবণাক্ততা কমিয়ে আনা হয়।

দ্বিস্তর মালচিং পদ্ধতির কার্যপ্রণালী

১. মাদা ফসল যেমন কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, তরমুজ ইত্যাদি চাষের জন্য মাদা তৈরি করতে হবে।

২. মাদার মাটি উঠিয়ে পাশে রেখে দিতে হবে।

৩. কর্ষণ স্তরের নীচে (কর্ষণ তলের উপরে) ধানের খড় মাল্চ স্থাপন করতে হবে।

৪. মাল্চ এর উপর সুষম সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে মাদা তৈরি করতে হবে।

৫. মাদা সবজির চারা বা বীজ এই সুষম সার মিশ্রিত মাটিতে রোপন করতে হবে।

৬. তারপর আবার মাটির উপরে (মাদার উপরে) দ্বিতীয়বার ধানের খড় মাল্চ দিতে হবে।

৭. নীচে স্তরের মাল্চ কৈশিক রন্ধ্র দিয়ে আগত লবণ পানির উপরে উঠে আসা প্রতিরোধ করবে এবং উপরের স্তর গাছের শিকড় অঞ্চলে আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে।

৮. এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির সার্বিক লবণাক্ততা কিছুটা কমে যায়।

চিত্র: মাদা তৈরির পূর্বে মাটি (লম্বচ্ছেদ)

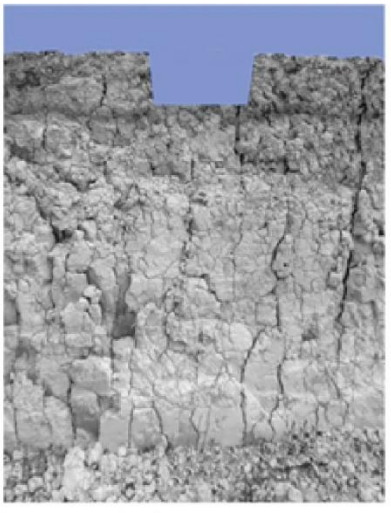

চিত্র: মাদার মাটি সরিয়ে রাখা হয়েছে (লম্বচ্ছেদ)

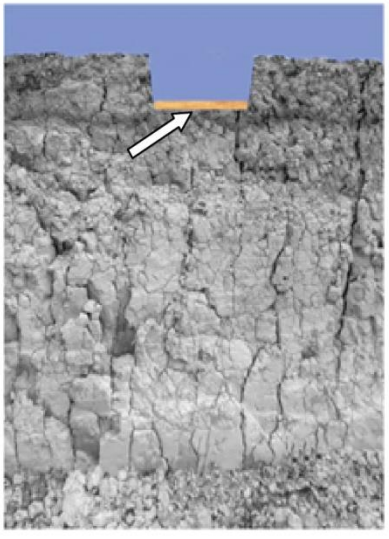

চিত্র: মাদার নিচে মাল্চ স্থাপন (লম্বচ্ছেদ)

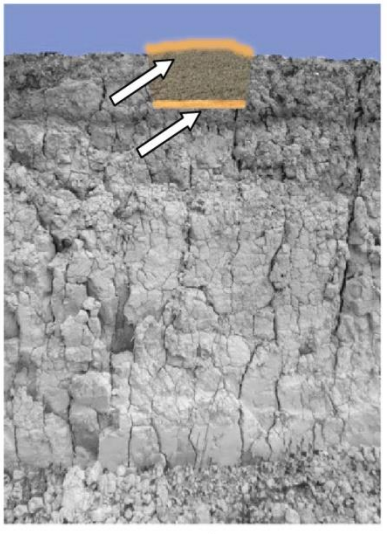

চিত্র: মাদা প্রস্তুতপূর্বক মাদার উপরে এবং নিচে মাল্চ স্থাপন (লম্বচ্ছেদ)

চিত্র: মাদার মাটি সরিয়ে রাখা হয়েছে।

চিত্র: মাদার নিচে মাল্চ স্থাপন

চিত্র: মাদা প্রস্তুতপূর্বক মাদার উপরে এবং নিচে মাল্চ স্থাপন

চিত্র: দ্বিস্তর বিশিষ্ট মাল্চ প্রদানকৃত প্লটে কুমড়া গাছ।

অগভীর রিজ এন্ড ফারো চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা সমূহের মাটি শুকনো মৌসুমে লবণাক্ত হয়ে যায়। এই এলাকার মাটি একদিকে যেমন লবণাক্ত তেমনি বুনটও এটেল বা এটেল দোঁআশ। এছাড়া, এই এলাকার ভূমি হতে দেরিতে পানি অপসারিত হয়। স্বল্প গভীরতায় লবণ পানির আধিক্য দেখা যায়। ফলে খুব সহজেই বাস্পীভবন প্রক্রিয়ার কারণে লবণ পানি গাছের শিকড় অঞ্চলে চলে আসে। এতে ফলন কম হয় অনেক ক্ষেত্রে গাছ মারাও যায়। এছাড়া হঠাৎ যদি কোন ঝড় বা বৃষ্টি আসে তাহলে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো না থাকার কারণে গাছের গোড়ায় পানি জমে যায়। এবং অল্প সময়েই গাছ মারা যায়। এই প্রতিকূলতাকে মাথায় রেখে রিজ ও ফারো পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে রিজের লবণাক্ততা ২-৩ ডিএস./মি. কম থাকে।

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট দুরত্বে জমির মাটি কেটে অল্প উঁচু (রিজ) তৈরি করা হয়। এর ফলে দুই রিজের মাঝখানে স্বল্প গভীর ফারো এর সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট রিজে চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, করলা ইত্যাদি বপন করা হয় এবং মাচায় গাছ উঠিয়ে দেয়া হয়।

রিজ তৈরির ফলে মাটির কৈশিক রন্ধ্র নষ্ট হয়ে যায়। ফলে নিচ হতে লবন পানি আর গাছের গোড়ায় পৌছাতে পারে না। অর্থ্যাৎ মাটির লবণাক্ততা কম থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, ফারো এর মাটির তুলনায় রিজ এর লবণাক্ততা ২-৩ ডিএস/মি. কম থাকে। এবং এর ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

এই রিজ ও ফারো পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হচ্ছে এটি মাটির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের কারণে ফসলের গোড়ায় পানি জমে ফসলের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

এই পদ্ধতিতে,

- জমিতে ৩-৪ ফুট দূরে দূরে নির্দিষ্ট গভীরতায় ৬-৯ ইঞ্চি উচ্চতার রিজ তৈরি করা হয়।
- রিজগুলোর মধ্যবর্তী স্থানগুলোর উপরিস্তরের মাটি নিড়ে রিজগুলো তৈরি করা হয়। শুষ্ক মাসগুলোতে মাটির লবনাক্ততার ঝুঁকি এবং হঠাৎ বৃষ্টির পানি জমার ঝুঁকি ছাড়াই অগভীর রিজগুলোতে ফসল জন্মে।

- শুষ্ক মৌসুমে ফসল কাটার পর এই রিজগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এই জমিগুলো পরে খরিফ-২ মৌসুমে রোপা আমন ফসলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

চিত্র: প্রস্তুতকৃত রিজ ও ফারো

চিত্র: রিজের উপর উৎপাদিত চিচিঙ্গা

ফ্লাইং বেড কৃষি

এটি একটি আধুনিক প্রযুক্তি যার মাধ্যমে চাষ করে লবণাক্ত পরিবেশে সন্তোষজনক ফলন পাওয়া সম্ভব। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সারা বছর লবণাক্ত এলাকায় সবজি চাষাবাদ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে ফ্লাইং বেডে লবণাক্ততার কোনও প্রভাব পড়ে না।

এই পদ্ধতিতে বড় প্লাস্টিকের ড্রাম কেটে ড্রামে নির্দিষ্ট মাত্রায় জৈব সার ও মাটি মিশ্রিত করে ড্রাম ভরাট করা হয়। এক্ষেত্রে ড্রামের নিচে কয়েকটা ছিদ্র করা হয়। তারপর কাটা ড্রামের নিচে কিছু পরিমাণ খোয়া জাতীয় জিনিস দিয়ে দেয়া হয়। এবং এর উপরে বর্ণিত জৈবসার ও মাটির মিশ্রণ দিয়ে দেওয়া হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ৬০% গোবর বা জৈব সার ও ৪০% মাটির মিশ্রণে গাছের বৃদ্ধি এবং ফলন ভালো হয়।

জৈবসার মিশ্রিত মাটি দ্বারা ভরাটকৃত ড্রামসমূহ এরপর জমির আইলের পাশে কনক্রিট বা বাঁশের খুটির উপর মাটি হতে প্রায় ২-৩ হাত উপরে বসিয়ে দেয়া হয়। এজন্য একে ফ্লাইং বেড বলা হয়। জমির আইলের পাশে স্থাপন করার ফলে সহজেই এর পরিচর্যা করা সম্ভব হয়। এছাড়া, আইলের পাশে স্থাপন করার ফলে আমন মৌসুমে আমন ধানের কোনও ক্ষতি করে না এবং খরিপ-১ মৌসুমে ফসলের পরিচর্যায় কোন বাধা সৃষ্টি করে না।

যেহেতু ড্রামগুলো মাটি হতে ২-৩ হাত উপরে স্থাপন করা হয়, সেহেতু লবণাক্ততার কোন প্রভাব এতে দেখা যায় না। ফলে সহজেই শুকনো (খরিফ-১) মৌসুমে যেকোন ফসল ফলানো যায়।

ফ্লাইং বেডে ব্যবহৃত উপাদান (প্লাষ্টিক ড্রাম, বাঁশ/কনক্রিটের খুটি ইত্যাদি) সহজে নষ্ট হয় না তাই একবার বেড তৈরি করতে পারলে এগুলো বেশ কয়েকবছর ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়।

ফ্লাইং বেডের মাধ্যমে বহুবিধ সুবিধা পাওয়া যায়। একদিকে শুকনো মৌসুমে লবণাক্ততার হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায় অন্যদিকে বর্ষাকালে যখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সবজি চাষের জায়গার অভাব দেখা যায়, তখন ফ্লাইং বেডের মাধ্যমে সেই অভাব পূরণ করে পারিবারিক চাহিদার সবজি চাষ করতে সক্ষম হবো।

চিত্র: মাঠে স্থাপিত ফ্লাইং বেড

চিত্রঃ ফ্লাইং বেডে বেগুনের চাষ

চিত্রঃ ফ্লাইং বেডে টমেটোর চাষ

চিত্রঃ ফ্লাইং বেডে বরবটির চাষ

লবণাক্ত এলাকায় বিনা চাষে ডিবলিং এবং চারা রোপন ও পলিব্যাগের চারা রোপন পদ্ধতিতে আগাম ভুট্টা চাষ

ভূমিকা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার অধিকাংশ জমি বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততায় আক্রান্ত । এই লবণাক্ত এলাকা বর্ষাকালে শুধুমাত্র আমন ধানের উৎপাদন ছাড়া সারাবছর পতিত থাকে, কারণ এলাকায় জমিতে জোঁ আসে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে, ফলে সেখানে বোরো ধান চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির স্বল্পতার জন্য চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না। এই পতিত জমিতে বিনা চাষে ডিবলিং এবং চারা রোপন পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। ডিবলিং পদ্ধতিতে নভেম্বর মাসে জমির অপেক্ষাকৃত উচু অংশে জমির উপরিভাগ হতে পানি সরে যাওয়ার পর বিনা চাষে নাড়ার মধ্যে বা নাড়া কেটে নির্দিষ্ট দুরত্বে বীজ বপন করা হয় এবং বীজতলায় ও পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা তৈরী করে নিয়ে ১৫-২০ দিন বয়সের চারা অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে নির্দিষ্ট দুরত্বে রোপন করে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে সুবিধা হলো সাধারনভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরী করে ভুট্টা চাষের অন্তত ১-১½ মাস আগেই জমিতে বীজ বপন/রোপন করা সম্ভব হয়, যার ফলে জমিতে লবণাক্ততা বাড়ার এবং ঝড় বৃষ্টি আসার আগেই ফসল তুলে নেয়া সম্ভব হয়। পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করলে পরবর্তীতে মূল জমিতে রোপন করলে গাছের উপর কোনও প্রভাব পড়ে না। এছাড়া এ পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমের পতিত জমিতে অতিরিক্ত একটি ফসল চাষ করে দেশে ভূট্টার আবাদ বাড়ানো তথা ফসলের নিবিড়তা বাড়ানোর উজ্জ্বল সম্ভবনা রয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

সাধারণ বিবরণ

লবণাক্ততা দক্ষিণ বঙ্গের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা, লবণাক্ততা শস্য উৎপাদনের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে সারা বছর গুটি কয়েক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। বিশেষ করে লবণাক্ততার জন্য রবি মৌসুমে কৃষি জমি পতিত থাকে। শুষ্ক মৌসুমে যদি ভুট্টা চাষ করা যায় তবে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং আমাদের কৃষিতে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হবে। ভুট্টা একটি অধিক ফলনশীল দানা শস্য। ভুট্টা Gramineae গোত্রের ফসল যার বৈজ্ঞানিক নাম Zea mays. ভুট্টার আদি নিবাস মেক্সিকো। ভুট্টার ফল মঞ্জরীকে মোচা বলে। মোচার ভিতরে দানা সৃষ্টি হয়। এই দানা ক্যারিওপসিস জাতীয় ফল, এতে ফলত্বক ও বীজত্বক একসাথে মিশে থাকে তাই ফল ও বীজ আলাদা করে চেনা যায় না। ধান ও গমের তুলনায় ভুট্টার পুষ্টিমান বেশি। ভুট্টার বাজার মূল্যও অনেক বেশি। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মাটি ভুট্টা চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভুট্টা একটি সম্ভাবনাময় ফসল বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে লবণাক্ততার জন্য চাষীরা ধান ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। ভুট্টা চাষাবাদের কলাকৌশল নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

উপযোগী পরিবেশ : ভুট্টার আদি নিবাস মেক্সিকো হলেও এটি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মে, বর্তমানে আমেরিকা, চায়না, ব্রাজিল, ভারত, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও মেক্সিকোতে ভাল হয়ে থাকে। ভুট্টা মূলত ২১ ডিগ্রী- ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভালো হয়ে থাকে যদিও ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। ভুট্টা চাষের জন্য ৫০ মি.মি. থেকে ১০০ মি.মি.বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন।

জীবনকাল : ১৩০ থেকে ১৫০ দিন

মাটি ঃ বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি ভুট্টা চাষের জন্য উপযোগী। তবে এটেল দোআঁশ ও এটেল মাটিতেও ভুট্টা চাষ করা সম্ভব। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিতে পানি জমে না থাকে। যে মাটিতে অধিক সময় "জোঁ" রাখা সম্ভব সেখানে ভুট্টা চাষ তুলনামুলক ভালো হয়।

ডিবলিং / রোপনের সময় : বাংলাদেশে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় মধ্য কার্তিক - মধ্য মাঘ (নভেম্বর- জানুয়ারি) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি : শুভ্রা, বর্ণালী ও মোহর জাতের ভুট্টার জন্য হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি , হাইব্রিড ভুট্টার বীজ হেক্টরপ্রতি ২০-২২ কেজি এবং খইভুট্টা জাতের জন্য ১৫-২০ কেজি হারে ভুট্টার বীজ বুনতে হয়। বীজ সারিতে বুনতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি। সারিতে ২৫ সেমি দূরত্বে ১টি অথবা ৫০ সেমি দূরত্বে ২টি গাছ রাখতে হবে।

বীজ বপন : বীজ ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে জমিতে বপন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। জমি চাষ ছাড়াই ভিজা মাটিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ বপন করতে হবে।

চিত্র: ডিবলিং পদ্ধতিতে ভুট্টার বীজ বপন

চিত্র: পলিব্যাগের চারা রোপন

চারা রোপনের ক্ষেত্রে : উঁচু জমিতে বীজ তলায় বা পলিব্যাগে চারা রোপন করে ১৫ হতে ২০ দিনের চারা মূল জমিতে রোপন করতে হবে। এক্ষেত্রেও জমি চাষ ছাড়াই ভিজা মাটিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রোপন করতে হবে।

চিত্র: বীজতলায় উৎপাদিত চারা মূল জমিতে রোপন।

সারের পরিমাণ : সংশ্লিষ্ট জমির মাটি পরীক্ষা করে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কতৃক হাইব্রিড ভুট্টা চাষে বিভিন্ন প্রকার সারের নির্ধারিত সাধারণ মাত্রা নিচে দেওয়া হলো ।

সারের নাম	**পরিমাণ/হেক্টর**
ইউরিয়া	৫০০-৫৫০ কেজি
টিএসপি	২৪০-২৬০ কেজি
এমওপি	১৮০-২২০ কেজি
জিপসাম	২৪০-২৬০ কেজি
জিংক সালফেট	১০-১৫ কেজি
বরিক এসিড (প্রয়োজন বোধে)	৫-৭ কেজি
গোবর	৪-৬ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : ডিবলিং এর ক্ষেত্রে চারার বয়স ১৫-২০ দিন হলে এবং রোপনকৃত চারার ক্ষেত্রে চারা রোপনের ২০ দিন পর চারার গোড়ায় ইউরিয়া সারের এক-তৃতীয়াংশ ও অন্য সকল সার মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে। এরপর সামান্য পানি সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া সার প্রথমবার দেয়া ১৫ দিন পর পর আরও দুইবার প্রয়োগ করতে হবে। ডিএপি সার প্রয়োগ করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে টিএসপি ও ইউরিয়া সারের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োগ করতে হবে। যদি ডিএপি সার প্রয়োগ করা হয় তাহলে চারা রোপনের ১৫ দিন পর হতে ১৫ দিন পর পর গুলিয়ে গোড়ায় প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সেচ প্রয়োগ পদ্ধতি : উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টার আশানুরুপ ফলন পেতে হলে রবি মৌসুমে সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। উদ্ভাবিত জাতে নিম্নরুপ ৩ টি সেচ দেওয়া যায়।

প্রথম সেচ ঃ বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে
দ্বিতীয় সেচ ঃ বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে
তৃতীয় সেচ ঃ মোচা তৈরির সময়

আগাছা দমন এবং পাতলাকরন : গাছের বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ডিবলিং এর পর চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে এবং চারা রোপনের ১৫ দিন পর জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে।

রোগ বালাই দমন

- সুস্থ, সবল ও ক্ষতমুক্ত বীজ এবং ভুট্টার বীজ পচা রোগ প্রতিরোধি জাত ব্যবহার করতে হবে।
- থিরাম বা ভিটাভেক্স (০.২৫%) প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ভুট্টার বীজ পচা রোগের আক্রমণ অনেক কমে যায়।
- ভুট্টার কান্ড পচা রোগ দমনের জন্য ছত্রাকনাশক ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

ভুট্টা সংগ্রহ : দানার জন্য ভুট্টা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোচা চকচকে খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হলে সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হয়। এ অবস্থায় মোচা থেকে ছাড়ানো বীজের গোড়ায় কালো দাগ দেখা যাবে। ভুট্টা গাছের মোচা ৭৫-৮০% পরিপক্ক হলে ভুট্টা সংগ্রহ করা যাবে।

চিত্র: ফুল আসার সময় ভুট্টা গাছ

চিত্র: মোচা তৈরির সময় ভুট্টা গাছ

অর্থনৈতিক অবদান : ভুট্টা একমাত্র উচ্চ উৎপাদনশীল ফসল যার বহুমূখী ব্যবহার আছে। বর্তমানে ভুট্টা চাষ ধানের থেকে অনেক বেশী লাভজনক। তুলনামুলক কম খরচে ভুট্টা থেকে আয় বেশী করা যায় যা কৃষকবান্ধব। ভুট্টা গো-খাদ্য, মাছের খাদ্য, পোল্ট্রি ফিড এবং সর্বোপরি মানুষের খাবার হিসেবে সর্বোত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

পলিব্যাগের চারা রোপনের মাধ্যমে লবণাক্ত এলাকায় আগাম তরমুজ চাষ

ভূমিকা

তরমুজ একটি বর্ষজীবী লতানো কুমড়া পরিবারের উদ্ভিদ। মাটি সুনিষ্কাশিত উর্বর ও উষ্ণ হলে তরমুজের শিকড় এক মিটার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তরমুজের অধিকাংশ জাত একবাসি বাকিগুলো পুং একবাসি। এর ফুল আকারে ছোট, বর্ণে সবুজাভ-হলুদ। তরমুজের ফলে বিভিন্নতা প্রচুর। ফল গোলাকার থেকে দন্ডাকারের মধ্যে যে কোন আকৃতির হতে পারে। আকারে ছোট এবং বীজ সবুজ, লাল ও একাধিক বর্ণের হয়ে থাকে। তরমুজ একটি লবনসহনশীল উদ্ভিদ। মাটির মাঝারি লবণাক্ততায় তরমুজ কোনও প্রকার ফলন হ্রাস ছাড়াই ফলন দেয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মাটিতে "জো" আসতে দেরি হয়। তাই "জো" আসার পর তরমুজ চাষ করলে পরবর্তীতে কাল-বৈশাখী ঝড়ের কবলে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করে সেই চারা রোপনের মাধ্যমে তরমুজ চাষ করলে আগাম তরমুজ চাষ করা সম্ভব হয়। এতে কৃষক অধিক লাভবান হয়।

তরমুজ চাষের অনুকূল জলবায়ু

তরমুজ চাষের জন্য প্রচুর সূর্যালোক ও শুষ্ক জলবায়ু প্রয়োজন। ইহা খুব ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। চাষের জন্য আদর্শ গড় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সে. ও ফল পাকার সময় ২৮-৩০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ফল পাকার সময় আলোর অভাব হলে ফলের স্বাদ ও মিষ্টতা কম হয়।

মাটির বৈশিষ্ট্য

নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত যে কোন প্রকারের মাটিতে তরমুজের চাষ করা চলে। তবে উর্বর বেলে দোঁআশ মাটি হতে এটেল দোঁআশ মাটি তরমুজ চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম।

উৎপাদন কৌশল

চাষের মৌসুম : বাংলাদেশে তরমুজ চাষে সব সময় ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ঝুঁকি থাকে এবং কোন কোন সময় এতে ফসলের খুব ক্ষতি হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে বীজ বোনা সর্বোত্তম, এর পূর্বে বোনা বীজ দেরীতে গজায়। তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সে. এর নিচে গেলেই বীজের অঙ্কুরোদগম মন্থর হয়ে আসে। মাদায় সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও চারা তৈরী করে মাদাতে রোপন করাই উত্তম।

মাদায় সরাসরি বীজ বপনের জন্য জমি বাছাই ও মাদা তৈরি

কুমড়া পরিবারের অন্যান্য সবজির মতো তরমুজের বীজ সরাসরি মাদায় রোপণ করে চাষ করা যায়। তবে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করে আগাম তরমুজ চাষ করা লাভজনক।

পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করে তরমুজের চাষ পদ্ধতি : তরমুজের বীজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে বীজ বপনের চেয়ে চারা রোপন করা উত্তম। এতে বীজের অপচয় কম হয়। পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করে রোপন করলে স্বাভাবিক সময়ের বেশ আগেই ফসল ঘরে তোলা সম্ভব এতে করে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক লাভবান হয়। পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করে রোপন করার আর একটি বড় সুবিধা হলো কালবৈশাখী ও শিলা বৃষ্টি আঘাত হানার পূর্বেই ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হয়।

বীজ শোধন : বীজবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সবল-সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন জরুরি। কেজি প্রতি ২ গ্রাম প্রোভক্স/ভিটাভ্যাক্স/ক্যাপটান/ব্যাভিস্টিন/সিনকার ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

বীজের পরিমান : তরমুজ চাষের জন্য প্রতি শতাংশ জমিতে ১ গ্রাম পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয়।

○ পলিব্যাগ প্রস্তুত

- পলিব্যাগে তরমুজের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩×৪ ইঞ্চি (৮×১০ সেমি) আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা হয়।
- সূর্যের তাপে শোধনকৃত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটি পলিব্যাগে ব্যবহার করা হলে সুস্থ-সবল চারা পাওয়া যায়।
- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ছিদ্রযুক্ত পলিব্যাগ ব্যবহার করতে হয়।

○ পলিব্যাগে বীজ বপন

- প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরী করে নিতে হবে। মাটিতে বীজ গজানোর জন্য জো নিশ্চিত করে (মাটিতে "জো" না থাকলে পানি দিয়ে জো করে নিতে হবে) তা পলিব্যাগে ভরতে হয়।
- ভালো অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ প্রতি পলিব্যাগে ১টি করে বুনাই যথেষ্ট। বীজের আকারের দ্বিগুন মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হয়।

○ শেড বা ছায়ার ব্যবস্থা

- আলো বাতাস স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমন জায়গায় ২০-২৫ সে.মি. উঁচু বেড নিতে হবে। বেডের উপর ৪.০ X ৫.২ মি. আকৃতির ঘর তৈরী করে নিতে হবে।

- ঘরের কিনারা বরাবর মাটি হতে ঘরের উচ্চতা হবে ০.৬ মি. এবং মাটি থেকে ঘরের মধ্যভাগের উচ্চতা হবে ১.৭ মি.।

- এ ঘর তৈরির জন্য বাঁশ, বাঁশের কঞ্চি, ছাউনির জন্য পলিথিন এবং এ গুলো বাঁধার জন্য সূতলী বা দড়ি দরকার হবে।

- বীজতলায় পলিথিনের ছাউনির নিচে চারা করে শীত কমলে মাঠে রোপন করা যেতে পারে। এতে তরমুজের চাষ ২০-২৫ দিন এগিয়ে যেতে পারে।

○ চারার পরিচর্যা

- চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে। পলিব্যাগের মাটি চটা বাঁধলে তা ভেঙে দিতে হবে।

- তরমুজের চারাগাছে রেড পামকিন বিটল নামে এক ধরনের পোকার আক্রমন হয়। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

○ বীজের সহজ অঙ্কুরোদগম

- তরমুজ বীজ ১৫ ডিগ্রী সে. বা এর নিচের তাপমাত্রায় গজায় না বলে চাষীরা শীতের সময় সমস্যায় পড়েন। বীজের অঙ্কুরোদগমনের জন্য কমপক্ষে ২৫-৩০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রার প্রয়োজন।

- শীতকালে খুব ঠান্ডা থাকলে বীজ ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে গোবরের/বালির ভিতরে, অল্প তাপমাত্রায় কিংবা বীজ পলিব্যাগে নিয়ে কারেন্টের বাল্বের কাছাকাছি ঝুলিয়ে রেখে দিলে ২-৩ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়।

- বীজের অঙ্কুর দেখা দিলেই বীজতলায় পলিব্যাগে কিংবা মাদায় বুনতে হয়।

চিত্র: বীজ বপনের জন্য প্রস্তুতকৃত পলিব্যাগ

চিত্র: পলিব্যাগে উৎপাদিত তরমুজের চারা

মুলজমি তৈরি

❖ জমি বাছাই ও তৈরি

- তরমুজ চাষের জন্য প্রথমেই জমি সঠিক হওয়া চাই। তরমুজ চাষে সেচ ও নিষ্কাশনের উত্তম সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি বাছাই করতে হবে। চাষ ও মই দিয়ে জমি ঢেলাহীন ও ঝুরঝুরে করতে হবে। তরমুজ গাছের শিকড় যথাযথ বৃদ্ধির জন্য জমি এবং গর্ত উত্তমরুপে প্রস্তুত করতে হবে।
- একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ পরিহার করতে পারলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কমানো যাবে।

বেড, নালা ও মাদা তৈরি

বেডের আকার	প্রস্থ	২৫০ সে.মি.
	দৈর্ঘ্য	জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে
	উচ্চতা	১৫-২০ সে.মি.
	বেড থেকে বেডের দূরত্বঃ নালা তৈরির জন্য যে ৬০ সেমি জায়গা রাখা হয় তাই হলো দুইটি বেডের মধ্যেকার দূরত্ব।	
নালার আকার	প্রস্থ	৬০ সে.মি.
	গভীরতা	১৫-২০ সে.মি.
মাদার আকার	ব্যাস	৫০ সে.মি.
	গভীরতা	৫০ সে.মি.
	তলদেশের ব্যাস	৫০ সে.মি.
	মাদা থেকে মাদার দূরত্বঃ ২৫০ সেমি প্রস্থ বিশিষ্ট বেডের দুই পাশ থেকে ২৫ সেমি করে জায়গা রেখে একটি বেডের মাঝে ১ সারি মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সারিতে মাদা থেকে মাদার দূরত্ব হবে ২ মিটার।	

সারের পরিমান ও প্রয়োগ (কেজি/শতাংশ)

মাটি পরীক্ষা করে সার প্রয়োগ করা উচিত। তবে মাটি পরীক্ষা করা না গেলে উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করা যেতে পারে। এছাড়া, কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (এইজেড) অনুযায়ী জমির উর্বরতার ধরনের ভিত্তিতে মূলজমিতে সার প্রয়োগ করা যায়। তরমুজ চাষের জন্য শতাংশ প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ নিম্নরুপঃ

(কেজি/শতাংশ)

সার	পরিমাণ
পচা গোবর/কম্পোস্ট	২০.০০
ইউরিয়া	০.৫৬০
টিএসপি	০.৭২০
এমওপি	০.৬৪০
জিপসাম	০.৪৪০
দস্তা (হেপ্টাহাইড্রেট)	০.০৫০
বোরিক এসিড	০.০৪০
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	০.১৬০
খৈল	২.০০

প্রয়োগ পদ্ধতি

মূল জমি তৈরির সময় জৈব সার, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা, ম্যাগনেসিয়াম ও বোরিক এসিডের সম্পূর্ণটা চারা রোপনের ৫-৭ দিন আগে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। নাইট্রোজেন সার চারা রোপনের ১৫, ৩৫, ৫৫ দিন পর মাটি আর্দ্র অবস্থায় গাছের চারিদিকে পার্শ্ব প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপন

- ২০-২৫ দিন বয়সের ২/৩ পাতা বিশিষ্ট ১টি চারা প্রতি মাদায় রোপন করা হয়।

- চারাগুলো রোপনের আগের দিন বিকালে পানি দিয়ে মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপন করতে হবে। মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, কোদাল দিয়ে এক কোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে।

- চারার পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি নির্দিষ্ট জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর গর্তে পানি দিতে হবে। পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপনের সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে মাটির দলা ভেঙে চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের (ফিউজারিয়াম উইল্ট) জীবাণু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হলে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হবে।

চিত্র: চারা অবস্থায় মাঠে তরমুজ

চিত্র: অঙ্গজ বৃদ্ধি অবস্থায় তরমুজ গাছ

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

❖ **সেচ ও নিষ্কাশন ঃ** তরমুজের ক্ষরা সহ্য করার ক্ষমতা থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে চাষ করা হয় বলে ফসলে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেচ ছাড়াই তরমুজের চাষ হয়, আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে খড়কুটো দিয়ে মাটি ঢেকে রাখা হয়। সেচ দেওয়ার চেয়ে খড়কুটো দিয়ে মাটি ঢেকে রাখার ব্যবস্থা মন্দ নয়। সেচের পর গাছের গোড়াতে যাতে পানি না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তরমুজের সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে পানি টেনে নেবে। প্রয়োজনে সেচনালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচ দেওয়া যায়। বৃষ্টি হলে ক্ষেতে যাতে পানি না জমে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

❖ **মালচিং ঃ** সেচের পর জমিতে চটা বেঁধে ও গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙে দিয়ে গোড়ায় মালচ দিতে হবে।

❖ **আগাছা দমন ঃ** কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির ঘাস তরমুজ-এর মোজাইক ভাইরাস রোগের আবাসস্থল। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয় বলে গাছে সারের অভাব পড়ে। ফলে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায় না। তাই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা

❖ **প্রুনিং (অতিরিক্ত শাখা ও ফল অপসারণ)**

- তরমুজের সবগুলো শাখা রেখে দিলে ঘন অঙ্গজ বৃদ্ধির কারনে ফলন হ্রাস পায়। খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি হয়, রোগবালাই, পোকামাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়, ফুল ও ফল ধরার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।
- প্রতি শাখায় ১টি ফল (১২-১৩ গিটে) রেখে অতিরিক্ত ফলগুলো ফেলে দিলে ভালো মান সম্পন্ন ফল পাওয়া যায়।
- তরমুজের ফল কত বড় হবে তা অনেকটা নির্ভর করে গাছে ফলের সংখ্যার উপর। এ জন্য প্রতি গাছে ১-২টির অতিরিক্ত ফল কচি অবস্থাতেই ফেলে দিতে হয়।
- গাছের শাখার মাঝামাঝি গিটে যে ফল হয় সেটিই রাখতে হয়।

চিত্র: ফলন্ত অবস্থায় তরমুজ

চিত্র: উত্তোলনকৃত তরমুজ

ফসল তোলা সংগ্রহ

জাত ও আবহাওয়া ভেদে তরমুজের ফল পরিপক্ক হতে বীজ বোনার পর থেকে ৭৫-৯০ দিন এবং স্ত্রী ফুলের পরাগায়ণের পর থেকে ৩০-৪৫ দিন সময় লাগে। তরমুজের ফল সংগ্রহের সঠিক সময় নির্ণয় করা একটু কঠিন, কারন অধিকাংশ জাতে পাকার কোন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না। গাছ থেকে আলাদা করার সাথে সাথে ফল পাকার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্য সম্পূর্ণ পাকার আগে সংগ্রহ করলে গুণ খারাপ হয়, পক্ষান্তরে বেশি পাকলে পরিবহনগুণ নষ্ট হয়। আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিলে অপক্ব ফলের শব্দ হবে ধাতব কিন্তু পাকা ফলের শব্দ হবে ড্যাবড্যাবে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

জীবনকাল

৭৫-৯০ দিন

ফলন

উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে একর প্রতি ৪০-৪৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

পলিথিন বা স্ট্র বেডে সবজি চাষ

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে মাত্র একটি ফসল আমন ধানের চাষ করা হয়। যেখানে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার শস্য নিবিড়তা ২৫০ এর বেশি, সেখানে এ এলাকার শস্য নিবিড়তা মাত্র ১৫৩ এর সামান্য বেশি। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র লবণাক্ত এলাকার শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে চলেছে। এমনই একটি প্রযুক্তি পলিথিন বা স্ট্রবেডে শাক জাতীয় ফসলের চাষ। লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিতে একটি স্বল্পমেয়াদি আমন ধান চাষের পর ভুট্টার চাষ করা হয়। এতে শস্য নিবিড়তা ২০০ তে উন্নীত করা সম্ভব। ভুট্টা ফসল মার্চ বা এপ্রিল মাসে উত্তোলন করা হয়। তারপর আমন ধান রোপনের পূর্বে জমি পতিত অবস্থায় থাকে।

এই সময়ে মাটিতে লবণাক্ততাও বিদ্যমান থাকে। এ সময়ে স্বল্প মেয়াদি শাক (যেমন-সবুজ শাক, লাল শাক, পালং শাক ইত্যাদি) চাষ করে শস্য নিবিড়তা আরও বাড়ানো সম্ভব।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে ৪ হাত চওড়া ও সুবিধামতো লম্বা একটি প্লট নির্বাচন করতে হবে। প্লটের কর্ষনস্তরের মাটি কোদাল দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে। তারপর কর্ষনতলের উপরে পলিথিন সীট বিছিয়ে দিতে হবে। ২-৩ হাত পরপর পলিথিন সীটের মাঝে ছোট ছোট ছিদ্র করে দিতে হবে। এরপর সরিয়ে রাখা মাটি আবার পলিথিন সীটের উপর বিছিয়ে দিতে হবে। বিছিয়ে দেয়া মাটির লবণাক্ততা পরিমাপ করতে হবে। যদি তা ২ ডিএস/মি. এর বেশি থাকে তাহলে মিষ্টি পানি দিয়ে সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। যাতে করে লবণ পানির সাথে মিশে পলিথিনের ছিদ্র দিয়ে মাটির নিচে চলে যায়। তারপর মাটিতে 'জো' আসলে শাকের বীজ বপন করতে হবে। একমাস বয়সী শাক উত্তোলন করা সম্ভব। এতে শস্য নিবিড়তা ৩০০ % এ উন্নীত করা সম্ভব। একই জমিতে আরও ২/৩ বার শাক চাষ সম্ভব। ফলে শস্য নিবিড়তা আরও বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য, পলিথিনের পরিবর্তে ধানের খড়ও ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে খড় ছোট ছোট (৪/৫ ইঞ্চি) করে কেটে কর্ষণ তলের উপরে ১ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিতে হবে। তারপর খড়ের উপরে মাটি বিছিয়ে দিতে হবে এবং মাটি লবণাক্ত থাকলে একইভাবে মিষ্টি পানির সেচ দিতে হবে।

এই পদ্ধতিতে মাটির নিচের লবণাক্ত পানি কৈশিক রন্ধ্র দিয়ে উঠে গাছের গোড়ায় আসতে পারে না। ফলে লবণাক্ততা কম থাকে এবং ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়।

চিত্র: বেড প্রস্তুতের জন্য মাটি সরিয়ে রাখা হচ্ছে

চিত্র: কর্ষণস্তরের নিচে ও কর্ষনতলের উপরে পলিথিন স্থাপন

চিত্র: প্রস্তুতকৃত পলিথিন বেড

চিত্র: পলিথিন বেডে উৎপাদিত লালশাক

দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি ঘেরের বেড়ি বাঁধে বর্ষাকালে (খরিফ-২ মৌসুমে) টমেটো চাষ

উপযোগী এলাকা

- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের চিংড়ি ঘেরের বেড়ি বাঁধসহ যেকোন সমতল ভূমি বা যেকোন বেড়ি (Ridge) তৈরি করে চাষাবাদ করা যায়।

বর্ষাকালে এই জাতের টমেটো চাষের সুবিধা

- শ্রাবণ মাসে চাষ করায় ঘেরের পানিতে ও বাধেঁর মাটিতে লবণ না থাকায় সহজে চাষ করা যায়।
- এই জাতের টমেটো চাষে পলিথিন ও হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এবং ১ বিঘা জমির চারিদিকের তৈরিকৃত বেড়িবাঁধে একসারি টমেটো চাষে ৩০,০০০/- ৩৫,০০০/- টাকা আয় সম্ভব।
- চওড়া বাঁধে দুই সারি টমেটো চাষে ৪৫,০০০/-৫০,০০০/- টাকা আয় করা সম্ভব।
- উল্লিখিত জাতের পাকা ফল ১০-১২ দিনেও পঁচে না।

চাষাবাদ পদ্ধতি

উপযোগী জাত : লাভলি, বিউটিফুল।

বীজতলা তৈরি: ৫ গ্রাম বীজের জন্য ৫০ বর্গফুট (১০ফুট X ৫ ফুট) জমির মাটি চাষ দিয়ে ঝুরঝুরে করতে হবে। বীজতলার চারিদিকে উঁচু বাঁধ দিতে হবে যাতে করে বর্ষার পানি ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। চারিদিকে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে যেন হাঁস-মুরগীতে বীজতলা নষ্ট না করতে পারে। এছাড়া, উপরে স্বচ্ছ পলিথিনের ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। বীজতলার মাটি তৈরির সময় ১০০ গ্রাম টিএসপি, ৭০ গ্রাম এমওপি, ১০০ গ্রাম জিপসাম (লবনাক্ত এলাকার জন্য) ১০০ গ্রাম দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। বীজতলা তৈরির শেষ চাষের ৫-৭ দিন পর মাটিতে বীজ বপন করতে হবে।

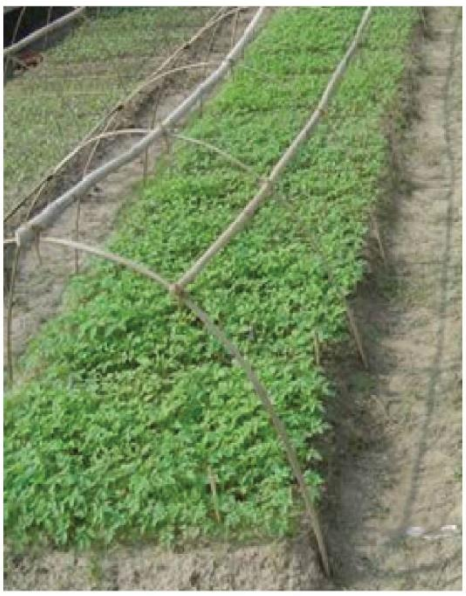

মাটিতে বীজ বপনের পূর্বে বীজ ২-৩ ঘন্টা রৌদ্রে শুকাতে হবে। তারপর ঠান্ডা করে একটি কাপড়ে বেঁধে ২৪ ঘন্টা পানিতে (লবণাক্ত এলাকার মিষ্টি পানি অথবা বৃষ্টির পানি) ভেজাতে হবে। তারপর বীজ পানি হতে তুলে ঝুলিয়ে রেখে ভাল করে পানি ঝরাতে হবে। তারপর বীজসহ কাপড়টিকে জাগ দেওয়ার জন্য খড়ের গাঁদা অথবা চটের বস্তার মধ্যে ৪৮-৭২ ঘন্টা রাখতে হবে। ৪৮ ঘন্টা পর পরীক্ষা করে দেখতে হবে বীজের মুখ ফেটে অংকুরোদগম হয়েছে কিনা। যদি হয় তাহলে তা বপন করতে হবে আর যদি না হয় তাহলে বীজে একটু পানি দিয়ে আরও ২৪ ঘন্টা জাগ দিয়ে রাখতে হবে। তারপর মাটিতে বপন করতে হবে।

বীজ বপনের সময়কাল

সাধারণত: বীজতলা তৈরির সময়কাল ১৫-২০ জুলাই এবং বীজ বপনের সময়কাল ২১-২৬ জুলাই।

বীজ বপন

অংকুরিত বীজ ঝুরঝুরে মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর গুড়া মাটি বীজের উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে বীজ ঐ মাটি দ্বারা ঢাকা পড়ে যায়। খেয়াল রাখতে হবে যেন বীজের উপর বেশি মাটি জমা না হয়।

বীজতলার পরিচর্যা

প্রয়োজনমতো সেচ দিতে হবে। যখন চারা ২-৩ ইঞ্চি (৪-৫ পাতা) লম্বা হবে তখন ২% (১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম) হারে থিওভিট (সালফার) স্প্রে করতে হবে। যদি কেঁচো উপদ্রব দেখা দেয় তাহলে ১০০ গ্রাম ফুরাডান ছড়িয়ে দিয়ে পানি সেচ দিতে হবে। বৃষ্টি আসলে অথবা কড়া রৌদ্রের সময় এবং রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। অন্য সময় পলিথিন খুলে দিতে হবে। যদি গাছে পচন রোগ দেখা দেয় অথবা গাছ মারা যেতে লাগে, তাহলে ২% হারে (১ লিটারে ২ গ্রাম) "রিডোমিল গোল্ড" (ম্যানকোজেব + মেটালেক্সিল) স্প্রে করতে হবে।

চারা রোপনের উপযুক্ত সময়

চারা রোপনের উপযুক্ত সময় ২০-২৫ আগস্ট। মাদা তৈরির অন্তত ১ সপ্তাহ পর মাদায় চারা রোপন করতে হবে।

মাদা তৈরি

ঘেরের পাড়ে ৬-৮ ইঞ্চি ব্যাসের মাদা তৈরি করতে হবে। মাদা তৈরির উপযুক্ত সময় ১৫-২০ আগস্ট। তবে দ্রুত বর্ধনশীল চারার ক্ষেত্রে আরও পূর্বে মাদা তৈরি করা যেতে পারে। মাদা তৈরির সময় প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হবে (সার ব্যবস্থাপনা নিম্নে বর্ণিত)। মাদা হতে মাদার দুরত্ব ২ ফুট।

চারা রোপন

বীজতলার মাটি চারা উত্তোলনের ৩-৪ ঘন্টা আগে পানি দিয়ে ভাল করে ভিজিয়ে দিতে হবে। তারপর মাটি নরম হয়ে এলে চারা উত্তোলন করতে হবে। চারা উত্তোলনের পরপরই কাদার দ্রবণে (পানি ও কাদার মিশ্রণ) চারার শিকড় ভেজাতে হবে। তারপর মাদায় চারা রোপন করতে হবে।

মাদার সার ব্যবস্থাপনা

বর্ষাকালীন টমেটো চাষের সার ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সাবধানতার সাথে সার ব্যবহার করতে হবে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে মাদায় সার প্রয়োগ করতে হবে।

	সারের পরিমাণ (গ্রাম/মাদা)						
	ইউরিয়া	ড্যাপ	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট	সলুবর (বোরন সার)	জৈব সার (সরিষার খৈল)
মাদা তৈরির সময়	-	১০	২০	১০	৪	-	২০
চারা রোপনের ৭-১০ দিন পর	৮-১০ দানা	-	-	-	-	-	-
চারা রোপনের ২০ দিন পর	৪	৮	-	২	২	২	-
চারা রোপনের ৩০ দিন পর	-	১৫	৫	-	-	-	-

ফুল ধরা শুরু হলে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে অবশিষ্ট সার হিসাব করে গুলিয়ে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। এজন্য প্রতি ৩০০ গাছের জন্য ৪ কিলোগ্রাম ড্যাপ সার ১০ লিটার পানিতে গুলিয়ে গাছের গোড়ার ৪ আঙুল দূর দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। একইভাবে প্রতি ১০ দিন পরপর প্রয়োগ করতে হবে।

ঠেস প্রদান

বর্ষাকালীন টমেটো চাষে ঠেস প্রদান অত্যাবশ্যক। সাধারণত পাটকাঠি ও বাঁশে কাঠি দ্বারা ঠেস তৈরি করা হয়। পাটকাঠির উচ্চতা ৩ হাত এবং বাঁশের কাঠির উচ্চতা হতে হবে সাড়ে তিন হাত। প্রতি গাছের গোড়ায় একটি করে পাটকাঠি সামান্য একটু কাত করে পুঁতে দিতে হবে। চারটি গাছের পর একটি করে বাঁশের পাটকাঠি দিতে হবে। ঘেরের চার কোণায় চারটি বড় বাঁশ পুততে হবে। তারপর ঐ বাঁশের সাথে সকল পাটকাঠি ও বাঁশের কাঠি নাইলনের সুতলি দিয়ে বাঁধে হবে। এজন্য ৩ হাত উচ্চতার জন্য ৪ ফুট সুতলি ব্যবহার করতে হবে। টমেটো গাছ বড় হওয়া শুরু করলে হালকা করে ঐ ঠেসের সাথে বেঁধে দিতে হবে।

অনুখাদ্য সার প্রয়োগ

চারা রোপনের ১৫ দিন পর হতে ১৫ দিন পরপর অনুখাদ্য সার (যেমন – Motivas) প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

বর্ষাকালে চাষ করলেও গাছের গোড়া শুকিয়ে যেতে পারে। তাই নিয়মিত সেচ প্রদান করা দরকার। সহজেই ঘেরের পানি দিয়ে সেচ প্রদান করা যায়।

দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ

চারা রোপনের ২০ দিন পর যখন সার প্রয়োগ করা হয় তখন প্রতি গাছের গোড়ায় সারের সঙ্গে মাটিতে দানাদার কীটনাশক (যেমন-ফুরাডান) প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ বালাই দমন

- টমেটো গাছে সাদা বা লাল মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সাথে সাথে ভার্টিমেক (এবামেক্টিন বেনজয়েট) সন্ধ্যার সময় গাছের পাতার উভয়পাশে স্প্রে করতে হবে।

- এছাড়া গাছে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হলে রিপকর্ড (সাইপারমেথ্রিন) স্প্রে করতে হবে।

- টমেটো গাছে লিফ কার্ল ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে। লিফ কার্ল ভাইরাস ছড়ায় সাধারণত সাদা মাছি ও জাব পোকার মাধ্যমে। তাই এই দুই পোকা (সাদা মাছি ও জাব পোকা) দমন করতে পারলে লিফ কার্ল ভাইরাসের আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব। এজন্য ১৫ দিন পর পর এডমায়ার (ইমিডাক্লোপিড) স্প্রে করতে হবে।

- বর্ষাকালে টমেটো চাষে আগাম ও নাবী ধ্বসা দেখা যায়। তাই নিয়মিত বালাইনাশক স্প্রে করতে হবে। এই (আগাম ও নাবী ধ্বসা) রোগ প্রতিরোধ করার জন্য চারা লাগানোর ১৫ দিন পর হতে ১৫ দিন পরপর রিডোমিল গোল্ড স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

চারা লাগানোর ৬০ দির পর ফল সংগ্রহ করা সম্ভব। ফল পরিপক্ব হওয়ার পর পিছনের দিকে হলুদাভ রং আসলেই ফল উত্তোলন করা যায়। একটি গাছ হতে ৩-৪ কেজি পরিপক্ক টমেটো উত্তোলন করা যায়।

ঘেরের বাঁধে উর্বর মাটি দ্বারা আস্তরিত করে সবজি চাষ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহ বিশেষ করে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও যশোর জেলার বেশকিছু অংশে জমিতে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘের পদ্ধতিতে চিংড়িসহ মাছ চাষ করা হয়। এই এলাকায় দুই প্রকার ঘের আছে, যথা- লবণ পানির ঘের ও মিষ্টি পানির ঘের। লবণ পানির ঘেরের পাড়ে ফসল উৎপাদন করা হয়না, কারণ মাটি ও পানি লবণাক্ত থাকে। অন্যদিকে মিষ্টি পানির ঘেরের পাড়ে প্রায় ২০ বছর আগের থেকেই বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার ফলন আশানুরুপ নয়। কারণ ঘেরের পাড় তৈরির সময়, অনুর্বর নিচের মাটি পাড়ের উপরে দিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গবেষণায় দেখা গেছে, যদি পাড়ে জমির উপরিস্তরের মাটি দিয়ে আস্তরিত করে দেয়া যায়, তাহলে তার উর্বরতা শক্তি ফিরে আসে। সেখানে যেকোনও সবজি তার ফলন পূর্ণমাত্রায় দিতে পারে।

ঘেরের পাড়ের মাটি যদি জমির উপরিস্তর দিয়ে আচ্ছাদিত করা যায়, সেখানে বিভিন্ন প্রকার সবজি যেমন- টমেটো, লাউ, করলা, শশা, মিষ্টিকুমড়া, চাল কুমড়া ইত্যাদি সহজেই চাষ করা সম্ভব এবং ফসলের ফলন কাংখিত মাত্রায় পাওয়া সম্ভব।

চিত্র: জমির উপরিস্তরের মাটি দিয়ে ঘেরের পাড় বাঁধা

চিত্র: মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদিত করলা

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্রে ক্রীনিং এর মাধ্যমে বাছাইকৃত লবণ সহনশীল ফসলের নাম ও জাত

লবণাক্ততা শ্রেণী	লবণাক্ততার পরিমাণ ইসিঃ ডিএস/মি	ফসলের নাম ও জাত	
		নাম	জাত
অতি সামান্য	২-৪	লাউ	ডায়না, মেটাল, সৃষ্টি
		চাল কুমড়া	স্থানীয় উন্নত, সবুজ বাংলা
সামান্য	৪-৮	ঝিংগা	দুলালী, বাসন্তী, লালতীর বারোমাসী, সিন্দাবাদ
		মিষ্টি কুমড়া	সুইটি, সুপ্রিয়া, ব্লাকসুইট,
		উচ্ছে	গঙ্গাজলী, রাণীপুকুর, রাণী-৩৫
মাঝারি	৮-১২	পুঁইশাক	দেশি, বারি পুঁইশাক-১, দেবগিরি
		শশা	মাধুরী, সেঞ্চুরী, লালতীর বারোমাসী, সুমাইয়া বারোমাসী
		চিচিঙ্গা	আশা, পদ্মা
		তিল	স্থানীয় উন্নত, বারি তিল-৪
		বাঙ্গী	চিনাল, রঙ্গিলা
অধিক	১২-১৬	তরমুজ	পাকিজা, ওয়ার্ল্ড কুইন, হানিসুইট, বিগপাকিজা
		ঢেঁড়শ	সুমি, আলো, শক্তি, শ্যামলী, গ্রীন অ্যাঞ্জেল, কমল, আভা
		ভুট্টা	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫,৬,৭,৯
		সূর্যমুখী	বারি সূর্যমুখী-২, হাইসান-৩৩ (হাইব্রিড)

চিত্র: সামান্য লবণাক্ত মাটিতে চাষকৃত উচ্ছে (জাত-রাণীপুকুর)

চিত্র: মাঝারি লবণাক্ত মাটিতে চাষকৃত চিচিঙ্গা (জাত-আশা)

চিত্র: অধিক লবণাক্ত মাটিতে চাষকৃত ঢেঁড়শ (জাত-সুমি)

উপসংহার

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে গবেষণা কেন্দ্র হতে উপর্যুক্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। আশা করি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততা কবলিত এলাকার কৃষকবৃন্দ এই সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপকৃত হবেন।